বাংলা প্রবাদ-প্রবচন : সমাজচিত্রে অধস্তন নারী

হাসান ইকবাল

প্রবাদ-প্রবচন আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই প্রবাদ-প্রবচন আছে। প্রবাদ ও প্রবচনে একটি জাতির জাতীয়-সংস্কৃতির, সমাজচিত্রের সূক্ষ্ম কিছু সংকেত উঠে আসে। আমাদের প্রবাদ-প্রবচনে বাঙালির নিজস্ব কথনভঙ্গি যেমন ধরা পড়ে, তেমনি ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, সমাজ, জগৎ, সংসার, পরিবেশ, কাল ও কৃষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত নির্যাসও স্ফটিকস্বচ্ছ জলছবি হয়ে ধরা পড়ে সময়ের আয়নায়।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রায় চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও মানবসমাজে প্রবাদের ব্যবহার ছিল। মানবজাতি গুহাবাস থেকে গৃহবাস অর্থাৎ পশুজীবনের গাঢ় অন্ধকার থেকে সভ্যজীবনের ক্ষীণ আলোতে প্রথম যখন পদক্ষেপ শুরু করেছিল, তখন থেকেই তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ সরস বাক্য বলার প্রবৃত্তি জেগেছিল। আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে পড়ে যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশে, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে। এলাকা, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, লোকরীতি, প্রথা, কালচার, লোকাচার, পরিবার, বিবাহ, সমাজ-কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, নরগোষ্ঠী, জাতি ও বর্ণ, জ্ঞাতিসম্পর্ক, ধর্ম, সামাজিক অসমতা, সামাজিক পরিবর্তন, সরলতা, রসিকতা, ব্যঞ্জনাময়তা— কোনো বিষয়ই বাদ যায় নি প্রবাদ-প্রবচন থেকে। বাদ যায় নি নারী প্রসঙ্গ, জেন্ডার, সম্পর্ক, আচার এবং বিশ্বাসও। সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক পাঠের বাইরে নয় এ বিষয়গুলো।

জীবনঘনিষ্ঠ অসংখ্য বিষয় উঠে এসেছে প্রবাদ-প্রবচনে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের প্রথা, রীতিনীতি, ধর্ম ও বিদ্রূপ থেকে শুরু করে সম্পর্ক, প্রেম ও স্নেহমায়ার মতো মানবিক বিষয়গুলোও এতে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি প্রবাদ-প্রবচনের অন্তরালে যেমন গল্প, কাহিনি ও বিবৃতি থাকে, তেমনি দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, হিংসা-বিদ্বেষ, তামাশা, দুর্ভোগ, সমস্যা, সমাধান, কৌতুক ইত্যাদি ভাবধারাও থাকে। জীবন-জগৎ সম্পর্কে তাদের তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ যুগ যুগ ধরে প্রবাদ হিসেবে বিরাজ করছে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, নারী, মজুর, কৃষক, পয়ারের কবি, ভাটকবি, হাটুরে কবি ও গীতালু সেসব প্রবাদের পরিচর্যাকেন্দ্র হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজই সেটার মূল ধারক, বাহক ও কথক।

দেখা যায়, পুরুষের পরিচর্যায় প্রবাদ-প্রবচনে কিঞ্চিৎ যৌনতা ও অশ্লীলতাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-মানসের মাধ্যমে ঠাঁই পেয়েছে, যেগুলো কখনো কারো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কখনো তাদের মনোজাগতিক চিন্তাসূত্রকে প্রকাশ করার জন্য, কখনোবা একটি ঘটনাকে আরো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার জন্য।

আমাদের মৌখিক ঐতিহ্য প্রবাদ-প্রবচনে নারীর পক্ষে-বিপক্ষে নানা দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, 'নারী মায়ের জাত' কথাটিতে যেমন নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে; অপরপক্ষে 'নারী পরের ভাগ্যে খায়' কথাটিতে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি অনুকম্পা। যেখানে নারী নিজের ভাগ্যে খায় আর পুরুষ নারীর ভাগ্যে বা তার অর্জনে খায়, সেখানে কেবল পুরুষতন্ত্রের মহিমায় কি কোনো পুরুষ

ঊর্ধ্বতন মর্যাদার দাবি রাখতে পারবে? বিলীয়মান কিছু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পুরুষতন্ত্র বিরাজ করে। দেশভেদে তারতম্য থাকলেও পুরুষদের ধারণা দেওয়া হয় যে, মর্যাদায় তারা নারীদের ঊর্ধ্বতন এবং নারী তাদের অধস্তন।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রবাদ-প্রবচনগুলোতে নারীকে দেখা যায় ভিন্ন একটি প্রপঞ্চ হিসেবে। নারীকে একটি আলাদা সত্তা হিসেবে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-মানস। এর মাধ্যমে আমরা দেখি নারীকে নিয়ে ভাষাগত লৈঙ্গিক রাজনীতির স্পষ্ট এক চিত্র। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই নারীর ভাষা ও রুচিবোধ মূলস্রোতে মিশে যেতে দেয় নি আমাদের সমাজের লোকাচার ও মূল্যবোধ। তাই দেখা যায়, বাংলা ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক শব্দ তৈরি হয়েছে নারীকে ঘিরে। গালিশব্দ থেকে শুরু করে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দগুলোর অধিকাংশই নারীকে অধস্তন করার মানসে চয়ন করা। কিছু শব্দ আছে, যা আমাদের অতি পরিচিত; কিন্তু এগুলো হয় স্ত্রীবাচক, নয় পুরুষবাচক। এগুলোর লিঙ্গান্তর করা যায় না।

একটা ব্যাপার খেয়াল করার মতো। সমাজে নারীদের প্রতিই বেশি নোংরা শব্দ ব্যবহৃত হয়; যেমন সতী, কুলটা, ঢেমনী, অসতী, সতীন, বেশ্যা, কলঙ্কিনী, নটী, খানকী, মাগী, পতিতা, ছিনাল ইত্যাদি। নারীর প্রতি এই ভাষাগত বিভাজন লিঙ্গ-বৈষম্য তৈরি করেছে ও করছে। নারীকে করে রাখতে চাইছে চার দেয়ালের অতন্দ্র প্রহরায় গৃহবন্দি।

মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিজেদের সুবিধামতো তৈরি করেছে প্রবাদ-প্রবচন, রীতিনীতি। আজকের দিনে এসব প্রবাদ-প্রবচন খুব বেশি প্রচলিত না হলেও বহুল ব্যবহৃত এসব প্রবাদ তৈরি করেছে নানা রীতিনীতি। তাই আজো নারী নিজের অজান্তেই প্রবাদ-প্রবচনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার লিখেছেন—

> বিশ্বপিতা স্ত্রী-পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিত ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব, বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক।

কিন্তু আমাদের দেশে যুগে যুগে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণে সর্বস্তরে আমাদের মননে বদ্ধমূল একটি ধারণা গেঁথে গেছে যে— নারী নিকৃষ্ট, পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

পুরুষের একটি বিশেষ রূপ হলো পতি। যুগে যুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'পতি'কে করেছে শ্রেষ্ঠ, 'স্ত্রী'কে নিকৃষ্ট। পতির শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে তৈরি হয়েছে সাহিত্য— গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক। তৈরি হয়েছে প্রবাদ-প্রবচন। আধুনিকতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও বর্তমান সমাজসদস্যদের গরিষ্ঠ অংশ মানসিকভাবে ধারণ করেন ওইসব প্রবাদ-প্রবচনে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গিই।

একটি লোকপ্রবচন বলে— 'পতি বিনে গতি নেই'। অর্থাৎ পতি ছাড়া নারীর কোনো গত্যন্তর নেই, পতি ছাড়া নারী চলতে পারে না। লৈঙ্গিক শ্রমবিভাজন আর জেন্ডার-অসম সম্পর্কের মধ্যে নারীকে

স্বামীর মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। এরকম লৈঙ্গিক সম্পর্কের আধার পিতৃতন্ত্র নিরন্তর প্রচারণা চালায় যে, স্বামীই নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সর্বাবস্থায় নারী স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। তার স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব নেই, বৃত্তি নেই, চাওয়া-পাওয়া নেই।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে গৃহশ্রমে আত্মনিয়োগ করতে প্ররোচিত করে। আবার তারা গৃহশ্রমে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করলেও তার সেই শ্রম গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃতি পায় না। এজন্য তারা কোনো পারিশ্রমিকও পায় না। ফলে গৃহে নারী আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কোনো সুযোগ পায় না। স্বাভাবিকভাবেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে স্বামীর ওপর। যুগ যুগ ধরে পিতৃতন্ত্র তাই এ আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছে ও প্রচার করেছে। পুরুষতন্ত্র এই প্রবাদবাক্য নির্মাণ ও প্রচার করেছে পুরুষের ওপর নারীর নির্ভরশীলতার মিথ নির্মাণ করতে। নারীকে সামগ্রিকভাবে পতির অধীন করে তোলাই পুরুষতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য।

আমাদের গ্রামীণ সমাজে (বৃহত্তর ময়মনসিংহে) একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—

রান্ধিয়া বাড়িয়া যেই নারী পতির আগে খায়,
সেই নারীর বাড়িতে শিগ্‌গির অলক্ষ্মী হামায়।

সমাজে প্রচলিত একটি রীতি আছে, রান্নাবান্না শেষ করে স্বামীর আগে নারীদের খাওয়া উচিত নয়। মেয়েরা স্বামী, শ্বশুর, ভাসুরের আগে খেতে বসে না, এতে নাকি সংসারের অনিষ্ট ও অকল্যাণ হয়। দেখা যায়, মেয়েরা শেষ পাতে খায় বলে তরকারির ভালো অংশগুলো তারা কখনো খেতে পারে না। অবশিষ্টাংশই কেবল তাদের ভাগে পড়ে। এ অংশ দিয়েই তারা খেয়ে ওঠে। এজন্য নারীদের অপুষ্টির পরিমাণ পুরুষের তুলনায় বেশি। প্রসূতি ও দুগ্ধদাত্রী মায়েরা এসব নিয়ম মানতে গিয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সময় পালটেছে— সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও আজ অনেক নারী পুরুষের পাশাপাশি বাড়ির বাইরের বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। অনেক সময় কর্মজীবী নারীদের পুরুষের আগেই কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। কাজেই এসব রীতি বা প্রবচনকে মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাবা অযৌক্তিক। কারণ স্বামীর আগে ভাত খাওয়ার সঙ্গে সংসারে অলক্ষ্মী আসা বা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক সামাজিকভাবে নির্ণয় করা হয়, তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা ব্যাখ্যা নেই।

পতির পায়ে থাকে মতি,
তবে তারে বলে সতী।

আমাদের সমাজে একজন নারীর জীবনের সঙ্গে তার সতীত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেভাবেই হোক জীবনের নানা পর্যায়ে নারীর নিজেকে সতী হিসেবে প্রমাণ দিতে হয়। কী করলে সতীত্ব নষ্ট হয়, কীভাবে সতীত্ব টিকিয়ে রাখা যায়, কেন সতীত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে— জীবনের সব পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে নারীকে তা শিখে নিতে হয় আর মেনে চলতে হয়। নারীর সতীত্ব বিয়ের আগে এক ধরনের থাকে, বিয়ের পরে তা অন্য। বিয়ের আগে নারীর সতীত্বের ধারণা নির্ভরশীল তার শরীরকে বাঁচিয়ে চলার ওপর। যে কোনো পরিস্থিতিতে পুরুষের কাছ থেকে নিজেকে

বাঁচিয়ে চলতে হয়, যেন তার 'কুমারিত্ব' অটুট থাকে। কুমারিত্বকে নারীর সবচেয়ে বড়ো সম্পদ বলে মনে করা হয়। বিয়ের পরে এর ধরন একটু ভিন্নতা পায়। তখন বলা হয় নিজের শরীরকে স্বামী ছাড়া পরপুরুষের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। এর সঙ্গেই নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়; যেমন, সে-ই সতী হিসেবে বিবেচিত হন, যিনি স্বামীর কথামতো নিজেকে তৈরি করে নেন। যেহেতু বিয়ের পর নারী স্বামীর অধীন এক সত্তা হিসেবে বিবেচিত হন, সে কারণে বিয়ের পরে তার স্থান হয় জীবনসঙ্গীর নিচে। স্বামী যেভাবে বলেন, যেভাবে চান, সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। এভাবেই সমাজে নারী 'সতী' হিসেবে পরিচিতি পান। সামাজিকভাবে নারীকে শেখানো হয় সতী হতে। বলা হয়, সতী হলে তবেই তার জীবন সার্থক। এই সতীত্ব নির্ভর করে বিবাহিত নারীর স্বামীর সন্তুষ্টির ওপর।

পুড়বে মেয়ে,
উড়বে ছাই—
তবে তার গুণ গাই।

সমাজের হাতে একটি জীবন্ত মেয়েকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারাকে বৈধতা দিতে সতীত্ব প্রথাটিকে মহত্ত্ব দেবার এ এক পিতৃতান্ত্রিক কৌশল। এরকম আরো প্রবাদ দেখা যায়, যেমন—

সতী নারী গঙ্গাজল
অসতী নারী বদ্ধজল।

কোথাও কোথাও আবার সতীত্বকে মর্যাদা দেবার জন্য সতী ও অসতী নারীর স্বামীর প্রসঙ্গ টেনে এনে তুলনা করা হয়—

সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া,
অসতীর পতি যেন ভাঙা পথের গুঁড়া।

আমরা জানি, ভারতবর্ষে মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার জন্য বলপ্রয়োগ যেমন করা হয়েছে, তেমনি চেষ্টা করা হয়েছে 'সহমরণ প্রথা'কে নারীমননের এক সম্মানজনক আসনে স্থান দেবার জন্যও। সহমরণ প্রথাকে বৈধতা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে নারীর ভিতরে প্রত্যয় উৎপাদনে। আর এই প্রত্যয় উৎপাদনের অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজ নারীর জন্য এক নির্দিষ্ট যাপনপ্রণালি গড়ে তোলে একেবারে শৈশব থেকেই। সেই যাপনপ্রণালিই নির্মাণ করে একটি মেয়ের মানসিক জগৎ, তার চেতনা ও মতাদর্শ। আর বেশিরভাগ সময়ই সারাজীবন ধরে এই মতাদর্শ ধারণ ও বহন করতে এবং এর বাহক হতে সে বাধ্য হয়। কখনো সচেতনভাবে, কখনোবা অসচেতনভাবে।

আঠার লাঙ্গের ঘর করে
সতী বইল্যা হাঁক মারে।

এই প্রবাদে এমন নারীর কথা বলা হয়েছে, বহু পুরুষের সঙ্গে যার যৌনসম্পর্ক রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একাধিক পুরুষের সাথে একজন নারীর যৌনসম্পর্ক স্বীকার করা হয় না। এখানে নারীর একগামিতাকে প্রাধান্য দিয়ে সতীত্ব, ইজ্জত, পবিত্রতা ইত্যাদি ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু

আমাদের সমাজে কখনোই পুরুষের বহুগামিতা নিন্দিত হয় নি। নারীর মতো অসতী আখ্যা দিয়ে তাকে সমাজচ্যুত করা হয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর ওপর সতীত্বের ধারণা চাপিয়ে তাদের অসম্মানিত করে চলেছে।

পতিহারা নারী
মাঝিহারা তরী।

মাঝিহীন নৌকা যতই সুন্দর হোক, ভারবহনে যতই সমর্থ হোক, বাস্তবে তা মূল্যহীন। একইভাবে মনে করা হয়, নারী হাজার গুণের অধিকারী হলেও তাকে চালানোর জন্য পুরুষের প্রয়োজন। নারীকে চালানোর দায়িত্ব বিয়ের পর তার স্বামীর। নানা ব্যাপারে নারীকে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। মনে করা হয়, যে নারী স্বামী হারায়, জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সে পৌঁছুতে পারে না। মাঝিবিহীন নৌকা যেমন স্রোতের বিপরীতে নিজে চলার সামর্থ্য রাখে না, তেমনই পতিবিহীন নারীর জীবনের গতিও ব্যাহত হয়। নারীর যে নিজের মতো করে জীবনযাপন করার ক্ষমতা নেই, সেটি প্রতিষ্ঠিত করতেই এ প্রবচনটি সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশাপাশি যা নারীর সহমরণ প্রথার যৌক্তিকতাও প্রতিপন্ন করে।

আমাদের সমাজে যে প্রবাদ-প্রবচনগুলো প্রচলিত আছে তার মধ্য দিয়ে কীভাবে এ ভূমিতে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের অনুশীলনের মাধ্যমে নারীকে অধস্তন করে দেওয়া হয়েছে, তারই চিত্র মূর্ত হয়ে আছে। এই মতাদর্শ নির্মাণ করতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নানা কৌশল অবলম্বন করে। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত নারীর যে বিশাল সৃজনক্ষেত্র তার একটা বড়ো অংশও এই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। শিশুরা শৈশবে বড়োদের কাছ থেকে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা, ব্রতকথা শুনে বড়ো হয়। তারা এগুলোর মাধ্যমে শেখে শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন। এগুলোর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় তাদের মূল্যবোধ। আর তার মধ্য দিয়েই একটু একটু করে কেউ পুরুষ, কেউ নারী হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত এখানে চলে আসে সিমোন দা বোভোয়া-র বহুল পরিচিত একটি মন্তব্য : 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, ক্রমে নারী হয়ে ওঠে'।

আমাদের লোকজীবনে প্রবাদ কেবল প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন ছবি হিসেবেই থাকে না, বরং বিবেচিত হয় লোকজীবনের অভিজ্ঞতার সার সংকলিত শিক্ষা হিসেবে, যে শিক্ষা লোকজীবন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহন করে। বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়গত বিন্যাস করলে নারী-বিষয়ক অনেক প্রবাদ-প্রবচন খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন—

ক. নারীর বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা;
খ. নারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক;
গ. বিভিন্ন সম্পর্কের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি;
ঘ. বিভিন্ন সামাজিক প্রথার প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি; এবং
ঙ. নারীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন বিষয়।

এখানে কিছু নির্বাচিত প্রবাদ-প্রবচন তুলে ধরা হলো, যেগুলোর মনোযোগ নারীতে এবং তাকে ছোট করায়।

ছেলের মুতে কড়ি,
মেয়ের গলায় দড়ি।

এই প্রবাদটি সমাজে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের স্থান বা মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়। এখানে একজন মেয়ের (মা) মুখ দিয়েই কন্যাসন্তানের তুলনায় পুত্রসন্তানের উঁচু মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। শুধু উঁচু মর্যাদাই নয়, কন্যাসন্তানের মৃত্যুকামনাও করা হয়েছে। এসব প্রবাদ সমাজমানসে এমন এক বোধের জন্ম দিয়েছে, যে বোধ এখনো সমভাবে বহমান। এখনো কন্যাসন্তানের জন্ম হলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবারসদস্যরা অখুশি হয়, মায়ের প্রতি অবহেলা করে। এমনকি তাকে অভিযুক্তও করা হয়। এরকম আরো কিছু প্রবাদ প্রচলিত আছে—

যার ঝি তার পোড়া
পাড়াপড়শির কাম খাড়া।

কিংবা,

মেয়ের নাম ফেলি
পরে নিলেও গেলি
যমে নিলেও গেলি।

কিছু প্রবাদের ভাবার্থে কথক নিজে নারী। নারী হয়ে অন্য আরেকজন নারীকে খাটো করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে এসব প্রবাদের স্রষ্টা পুরুষ।

বউ নয় রে, বউ নয়— গরল ডাকিনী
দিনের বেলায় মানুষের ছা— রাত হলে বাঘিনী!

এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসা মেয়েটি সম্পর্কে শাশুড়ি ও ননদের মনোভাব ফুটে উঠেছে নিচের প্রবাদটিতে।

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন?
না, তুর্কি ঘোড়া যেমন;
বউয়ের গলার স্বর কেমন?
না, শালিক কেঁকায় যেমন।

এখানে বউয়ের চলাফেরার সাথে তুর্কি ঘোড়া ও গলার স্বরের সাথে শালিকের গলার তুলনা করে ব্যঙ্গ ও নিন্দা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে বউয়ের যাতনাকর দিনযাপনপ্রণালি মূর্ত হয়েছে।

মায়ে রাঁধে যেমন-তেমন, বোনে রাঁধে পানি
ও অভাগী রাঁধে যেন চিনি পরমান্নি।

অথবা

মায়ে রাঁধে যেমন-তেমন, বোনে রাঁধে ছাই

ওই আবাগী রেঁধে দিল মধুর তরে খাই।

এখানে পুত্র তার মায়ের রান্নাকে দূর ছাই করে স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করায় শাশুড়ি সেই বউকে 'অভাগী' 'আবাগী' বলে গাল দিয়েছে। কোনো কারণে হয়ত পুত্রের সঙ্গে মায়ের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। পুত্রের সেই কৃতকর্মের জন্য প্রবাদটিতে গালি দেওয়া হয়েছে বউকে। পুরুষের অন্যায়ের ফল ভুগতে হচ্ছে নারীকে। এর ভিতর দিয়ে একটি পুরুষের অন্যায় দুটি নারীর সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার জন্ম দিচ্ছে। তা ছাড়া, এখানে রান্না করা বিষয়টিকে নারীসত্তার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করে দেখানো হচ্ছে।

ননদিনী রায় বাঘিনি,
দাঁড়িয়ে আছে কাল সাপিনি।

বাঙালি সমাজে পরিবারের মধ্যে যারা সব থেকে বেশি সময় পরস্পরের সঙ্গে কাটান এবং প্রত্যেকেই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে নিষ্পেষিত হন তারা হলেন শাশুড়ি, বউ ও ননদ। লক্ষ করার বিষয় হলো, এই নিষ্পেষিত বর্গের মধ্যে যেমন ঐক্য-কামনা থাকে, তেমনি সেখানে পরস্পরের প্রতি চূড়ান্ত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবও পোষণ করে। এই প্রবাদগুলোর মধ্যে সেই বিদ্বেষভাব ফুটে উঠেছে; যেমন বউ তার ননদকে বাঘিনি, সাপিনির সঙ্গে তুলনা করছে।

শাশুড়ি মরল সকালে
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে তো,
কাঁদব গিয়ে বিকালে।

এখানে শাশুড়ির প্রতি বউয়ের তীব্র বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠেছে। শাশুড়ির মৃত্যুতে বউয়ের মধ্যে দুঃখ তো নয়ই বরং এক ধরনের আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রবাদে এক নারীর প্রতি বিরোধপূর্ণ তাচ্ছিল্যের বয়ান রচিত হয়েছে অন্য নারীর মুখে।

পরিবার নামক পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটিকে একভাবে রক্ষা করার দায় ও দায়িত্ব দুই-ই বর্তায় পরিবারের কর্ত্রী নারীর হাতে। পুরোনো যৌথ পরিবার-ব্যবস্থায় এই কর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মূলত শাশুড়িই। শাশুড়ি যখন বাড়ির বউ হিসেবে এসেছিলেন, তখন পরিবার নামক পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি তাকে শোষণ করেছে। আবার তিনি নিজে যখন শাশুড়ি, তখনো ওই শোষণমূলক পরিবার-কাঠামোটিকে ভাঙা বা দুর্বল করার বদলে স্বভাববশতই পিতৃতন্ত্রের হাতের পুতুল হয়ে এটিকে শক্তিশালী করবার দায়িত্বটিই তিনি পালন করতে থাকেন। আর এ দায়িত্বটি ভালোভাবে পালন করা মানেই অন্য নারীকে শোষণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাতে শাশুড়ি ও বউয়ের মধ্যকার সম্পর্কটি অনুশীলন এবং অনুভূতির দিক থেকে সংবেদী না হয়ে বিপ্রতীপ হয়েই রয়ে যায়।

দাদা কি বউ মারে?
গামছার বাড়ি মেরে তামসা করে।

ভাইবৌ-এর সম্পর্কে ননদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এখানে। দাদা তার বউকে মারের ভঙ্গি করলেও আসলে মারে না বলে বোন দাদাকে বিদ্রূপ করছে। দুটি নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষভাবের উদাহরণ এটি।

কানা পুতে পোষে,
রাজা ঝিয়ে শোষে।

ছেলে অক্ষম হলেও মাকে দেখে, কন্যা ধনী হলেও মা-বাবাকে শোষণ করে যায়। ছেলে-মেয়ে দুই-ই এক মায়ের সন্তান। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ এখানে মেয়েসন্তানের প্রতি মায়ের বিদ্বেষ তৈরি করেছে। এর নেপথ্যে ভূমিকা রাখে যৌতুকপ্রথা, যে প্রথা তৈরি করেছে ও টিকিয়ে রেখেছে এই পুরুষতন্ত্রই।

মরদের জিদে বাদশা
মেয়ের জিদে বেশ্যা।

সমাজ কীভাবে একজনকে নারী হিসেবে তৈরি করে এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। এখানে পুরুষ ও নারীর আচরণ-বিধির ভিন্নতা নির্দেশ করে যাপনপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, যেখানে পুরুষের পক্ষে জিদে অবিচল থাকাকেই কাম্যজ্ঞান করা হচ্ছে। আর নারীর ক্ষেত্রে জিদে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে।

বাংলায় মেয়েলি প্রবাদ বলে যেগুলো প্রচলিত, এখানে তার মধ্যে কিছু প্রবাদকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হলো। যতই এগুলো নারীর বয়ানে রচিত হোক না কেন, তা ভয়াবহভাবে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত, যার নেপথ্য অনুঘটক পুরুষ নিজে। আফ্রিকার প্রবাদে যেমন নারীকে নির্মাণ করা হয়েছে—

জলের মুখ জগৎ যেমন
নারীর মুখ স্বামী তেমন।

বাংলাদেশের অসংখ্য প্রবাদেও নারীর প্রতি এরকম বৈষম্যমূলক মনোভাব লক্ষ করা যায়।

পতি ছাড়া কামিনী
শশী ছাড়া যামিনী।

বা,

পুরুষের বল টাকা
নারীর বল শাঁখা।

নারীর প্রতি কর্তৃত্বপরায়ণ, পিতৃতান্ত্রিক এবং অধিপতিসুলভ ভাবাদর্শ নারীকে একটা সামাজিক ক্যাটাগরি হিসেবে নির্মাণ করে। তাদের পুরুষের অধীনস্ত করা হয়। ফলে পুরুষকুল নারীদের সমান

মর্যাদায় দেখতে পারে না, বরং দেখে নিচু চোখে। আর তাই সমাজের কাছে নারী বিশ্বস্ত হিসেবে স্বীকৃত হয় না।

দুয়াক না দেখাই ঘুঘুর বাসা
মাইয়াক না কই বিশ্বাসের কতা।

বিশ্বাস যে তাদের করাই যায় না, সেটা বোঝানো হয়েছে নিচের প্রবাদটিতেও, যেখানে দেখানো হচ্ছে যে, তারা ভাত খায় স্বামীর, কিন্তু অভিসারে যায় নাগরের সাথে—

স্বামীর ভাত টগর-মগর
হাঁটিয়া নাগর।

অবিশ্বাসযোগ্য নারীর এই বৈশিষ্ট্য সমাজে এতটাই স্বাভাবিক বলে দেখানো হয় যে, প্রচলিত কিছু প্রবাদ শুনতে রীতিমতো কুৎসিৎ লাগে—

মা কান্দে বেটির তানে
বেটি কান্দে নাঙ্গের টানে।

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে আহাম্মক বিষয়ক অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ একটি প্রবচন প্রচলিত আছে। 'আহাম্মক' আরবি শব্দ, যার মূল অর্থ হলো নির্বোধ।

আহাম্মক নম্বর সাত,
যে শ্বশুরবাড়ি খায় ভাত।
আহাম্মক নম্বর আট,
যে আপন মাগকে পাঠায় হাট।
আহাম্মক নম্বর নয়,
যে ঘর থাকতে পরের ঘরে বয়।
আহাম্মক নম্বর দশ,
যে মাগীর কথার বশ।

এখানে পুরুষকেই আহাম্মক হিসেবে গ্রেডিং করা হচ্ছে তা ঠিক। কিন্তু সে গ্রেডিংয়ের ভিত্তি স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক। অর্থাৎ এটি একজন পুরুষ স্ত্রীর সাথে কেমন সম্পর্ক রাখবে না রাখবে সেটাই শিখিয়ে দিতে চাচ্ছে। বলা হচ্ছে, পুরুষরা যদি নারীর কথা শুনে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়, তাহলে সে পুরুষ নির্বোধ, যেটি পিতৃতন্ত্রের একটা অপকৌশলের আখ্যান।

বউ নয় ত হীরে
কলে দিয়েছি ছিঁড়ে।

এটি নারীকে নিয়ে তাচ্ছিল্য মেশানো যৌনগন্ধী উক্তি। নারী কোনো মানুষ নয়, ভোগের বা খেলাধুলার সামগ্রী, যাকে কিনা ছিঁড়ে ফেলা যায়।

কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান
বাপের বাড়ি থাকলে কন্যা বাড়ে অপমান।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তার পিতার আবাসস্থলে থাকাটাকে হীন চোখে দেখে সমাজ-মানস। বিপরীতে স্বামীর বাড়ি থাকাটাকে মহৎ কাজের অংশ বলে মনে করা হয়।

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে
না জানি রাঁধুনী মোর কেমন করে রাঁধে।

রান্নাবান্না না জানাটা মেয়েদের জন্য একটা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তেমন নারীকে ভিন্নচোখে দেখা হয়। তাই স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে উদ্বিগ্ন তার স্ত্রী কেমন রাঁধতে পারে।

লোহা জব্দ কামারবাড়ি
মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ি।

লোহাকে পিটিয়ে যেমন কামার বিভিন্ন আকৃতি দেয়, তেমনি নারীদের নানাভাবে জব্দ করা হয় শ্বশুরবাড়িতে। দেবর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি থেকে শুরু করে বাড়ির প্রতিটি সদস্যই বিবাহিত মেয়েটির প্রতি শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার যাবতীয় আচার-আচরণ, রান্নাবান্না, ঘুম, খাওয়া থেকে সব জায়গায়।

আন্ মাগীর আন্ চিন্তে
দুয়ো মাগীর পতি চিন্তে।

'মাগী' শব্দটির দ্বারা এখানে এক ধরনের তাচ্ছিল্যের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। নারী যেন মূল্যহীন এক প্রাণী। তাদের কোনো বোধশক্তি বা রুচি-বোধ নেই। তবে উক্ত প্রবাদে স্বামীকে নিয়ে নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। অন্য নারীর সাংসারিক অনেক ভাবনা আছে। কিন্তু যে নারীর সতীন থাকে, সে সকল কাজের মধ্যেই স্বামীর ভাবনা ভেবে থাকে।

শ্বশুরবাড়ি মথুরাপুরী
দু'দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

একজন বিবাহিত মেয়ের ওপর নির্যাতনের চিত্রই ফুটে ওঠে এই প্রবাদে। প্রথম প্রথম সুশীলসুলভ আচরণ দেখালেও কিছুদিন অতিবাহিত হলেই পুরুষতান্ত্রিক নৃশংসতার আসল চিত্র ফুঠে ওঠে। পিতৃতন্ত্রের এই কৌশলের কাছে নারী সব সময় অসহায়। কিংবা সব সময় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে শোষণের মুখে নিজেকে আরো রক্তাক্ত করে তোলে।

অকেজো বউ
লাউ কুটতে দড়।

সংসারের সকল কাজ সুচারুভাবে করতে পারলে নারী হয়ে ওঠে লক্ষ্মী। আর পরিবারের সকল কাজ ঠিকভাবে করতে না পারলে নারীর ভাগ্যে জোটে অপমান ও বঞ্চনা। এই প্রবাদটি পুরুষতান্ত্রিক

সমাজেরই সৃষ্টি। এতে বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে, যে বউ ঘরের কাজ করতে বিশেষ পটু নয়, সে লাউ কোটার মতো অতি সহজ কাজ করায় ব্যস্ত হয়।

অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

উভয় সংকটে নারী। এখানে বলা হচ্ছে, যে নারী ছোটবেলা থেকেই গৃহিণীপনায় সুপক্ব হয়, তারা প্রায়ই স্বামীর ঘর করতে পারে না। আর অতিশয় সুন্দরী নারীর অদৃষ্টে প্রায়ই ভালো বর জোটে না।

'একবরে' ভাতারের মাগ
চিংড়ী মাছের খোসা,
'দোজবরে' ভাতারের মাগ
নিত্যি করেন গোসা।
'তেজবরে' ভাতারের মাগ
সঙ্গে বসে খায়,
'চারবরে' ভাতারের মাগ
কাঁধে চড়ে যায়।

একবরের স্ত্রী হেলাদোলা
দোজবরের স্ত্রী গলার মালা।

এই প্রবচনে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের বহুবিয়ের যেমন একটি সমাজচিত্র পাওয়া যায়, তেমনি অবস্থানভেদে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে উঠেছে। নারী যেন এক খেলনা, হাতের পুতুল। যখন খুশি বিয়ে করল, যখন খুশি ছেড়ে দিল। এরকম দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষ পোষণ করে বলেই একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে। তবে উক্ত ছড়া-প্রবাদে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী প্রথম পক্ষের পত্নী অপেক্ষা স্বামীর অধিকতর আদরণীয়া হয়। তবে 'মাগ' কিংবা 'মাগী' শব্দটির প্রয়োগের ব্যাপারে আপত্তি থেকেই যায়। 'মাগ' বলতে এখানে পত্নী/স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে এবং 'ভাতার' বলতে পতি/স্বামীকে বোঝানো হয়েছে।

ওঠ ছুড়ি তোর বিয়া।

সমাজে নারীর পরিসর ও মতামত প্রকাশের অধিকার ক্ষীণ হয়ে আসে যখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাদের দমনপীড়ন নীতির প্রতিফলন ঘটায়। নারীর মেধা, মনন সবকিছুই তখন বাধাগ্রস্ত হয়। মূল ভাবার্থের দিকে তাকালে আমরা বুঝি, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ কোনো বড়ো কাজ করতে যাওয়ার দিকে। কিন্তু আমাদের সমাজে এমনটি ঘটছে অহরহ। নারীর কোনো মতামত ছাড়াই বিয়ের ঘটা করা হয়। যে পুরুষের হাতে মেয়েটিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাকে মেয়েটির পছন্দ হলো কি হলো না, সে বিষয়ের কোনো তোয়াক্কাই করা হয় না।

কুড়ি হইলেই বুড়ি।

নারীর বয়স যেন কচু পাতার পানির মতো টলমলানো। একটু বাতাসেই পড়ে যায়। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। বয়স কুড়ি পার হলে যেন তার আর কোনো সাধ-আহ্লাদ, জৌলুস থাকে না। পুরুষসমাজ স্বভাবতই তাকে অবদমনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বুড়ি বানিয়ে ফেলে। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। পুরুষ আশি বছরের বৃদ্ধ হলেও তাকে বলা হয় জোয়ান। পত্রিকার শিরোনামেও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যে, 'আশি বছরের কফিলদ্দি বিয়ে করল ষোলো বছরের কিশোরীকে।' পুরো বিষয়টিই আমাদের সমাজে পুরুষতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার একটা যোগফল। সেখানে বয়স কোনো মূল বিষয় নয়। কাজেই বোঝা যায়, নারীদের কুড়িতে বুড়ি ঠাওরানো তাদের একটি উদ্দেশ্যমূলক অবস্থান।

ভাতারে ডাকে না কাছে
মাগ বলে আমার আদর আছে।

স্বামী তার স্ত্রীকে ভালো না বাসলেও স্ত্রী বলে বেড়ায় স্বামী তাকে ঠিকই আদর-সোহাগ করে, ভালোবাসে। কারণ সমাজ মনে করে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া যে কোনো নারীর জন্য মর্যাদাকর। তাই সে নিজের মর্যাদা অটুট রাখার জন্যই মিথ্যা কথা বলে।

গাইছ্যা মাগী গাছ বায়
নডী মাগী তামুক খায়।

আমাদের সমাজে মেয়েদের গাছে আরোহণ, ধূমপান বা তামাক সেবন নিন্দনীয়। তামাক সেবন নিন্দনীয় সবার জন্যই হওয়া উচিত, কারণ এতে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু সমাজে শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই এই বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। একইভাবে গাছে আরোহণ করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা কেবল নারীর প্রতিই পরিলক্ষিত হয়।

—খানকি,
তার আবার মান কী;

সমাজ মনে করে, যে নারী কুলত্যাগ করে বাড়ির বাইরে চলে গেছে কিংবা অবৈধ পেশায় নিয়োজিত হয়েছে তার কোনো মানসম্মান নেই, যদিও আমাদের সমাজের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্ররোচনায়ই কিছু নারী পেশাদার যৌনকর্মী হতে বাধ্য হয়।

প্রবাদ-প্রবচন আমাদের সমাজে সৃষ্ট হলেও তা রচিত হয়েছে মূলত পুরুষের পরিচর্যায়। তাই প্রবাদগুলোতে দেখা যায় স্বেচ্ছাচারিতামূলক উক্তির ব্যবহার, যেখানে প্রায়শ নারী অধস্তনতা ও অবজ্ঞার শিকার। প্রবাদ-প্রবচনসমূহে প্রায় সবসময়ই নারীকে দোষারোপ করা হয়েছেএ সেখানে সে চরণদাসী, কলঙ্কিনী, অসতী, কুলটা, মাগী, বেহায়া। সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকাকে প্রবাদ-প্রবচনে পদে পদে অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে নারীর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই, বোধ নেই, নেই কোনো পছন্দ-অপছন্দ। নারীর গুণ, শিক্ষা, বিবেক, ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার ও অবদমিত করতে পুরুষরা যুগ যুগ ধরে তাকে নিপীড়ন করেছে ও নিপীড়নমূলক বাণী শুনিয়েছে। নারীর কোনো ভাষা নেই, পুরুষের চয়ন করা ভাষাই যেন নারীর ভাষা। তাই এ সময়ে এসে আমাদের এসব কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে

আসতে হবে। এসব পুরুষতান্ত্রিক নির্মাণকে দুমড়ে মুচড়ে বা পাশ কাটিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগোতে হবে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য। জয়তু নারী।

হাসান ইকবাল লেখক, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর স্পন্সরশিপ অপারেশন্স বিভাগের কর্মকর্তা। hasan_netsu@yahoo.com

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ, ওয়াকিল, *প্রবাদ ও প্রবচন*, ২০০৯, আনন্দধারা, ঢাকা।

২. চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদিত), *নারী পৃথিবী : বহুস্বর*, ২০১১, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা।

৩. চক্রবর্তী, সুস্মিতা, *ফোকলোর ও জেন্ডার : লোক ঐতিহ্যে পিতৃতন্ত্র ও নারীর স্বতন্ত্র স্বর*, ২০১৪, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৪. ইকবাল, হাসান, *নেত্রকোনার প্রবাদ-প্রবচন ও লোকছড়া*, ২০১৪, রাঁচী গ্রন্থনিকেতন, ঢাকা।

৫. মিত্র, সুবলচন্দ্র, *বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন*, ২০১৩, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

৬. পাঠান, মোহাম্মদ হানীফ, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*, ২০১২, অবসর প্রকাশ, ঢাকা।

৭. সিকদার, সৌরভ ও নাসরিন, সালমা, *বাংলা ভাষায় নারী শব্দাভিধান*, ২০০৯, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৮. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, *বচন ও প্রবচন*, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।